তারিখ 14 SEP 1988
পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

দৈনিক ইনকিলাব
ড দোনক ইনাকলাব

গণশিক্ষা বিস্তারে শেরে বাংলার অবদান

—মুহম্মদ আবদুল খালেক

দেশের জাতীয় দুর্দিনে মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। জাতীয় দুর্দিনে এক এক দেশে এক একজন মহামানবের আগমন ঘটেছে এবং দেশের অবনতি ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। এ সত্য দেখা গেছে যুগে যুগে দেশে দেশে।

এ দেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, ঐতিহাসিক সিপাহী যুদ্ধের পর ভারতবর্ষ উপমহাদেশে শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হকের আবির্ভাব ঘটে। এ দেশের সাধারণ মানুষ বিশেষ করে বাংলার মুসলমান সমাজ তখন অশিক্ষা, দারিদ্র্য আর হতাশায় চরমভাবে অধঃপতিত। এই অধঃপতিত জাতিকে উদ্ধার করেন শেরে বাংলা ফজলুল হক। এ দেশের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি তথা রাজনৈতিক চেতনা, স্বাধিকার-অধিকারবোধ এবং সামাজিক প্রগতির প্রথম সার্থক মশালধারীই তিনি।

দেশের প্রবহমান রাজনৈতিক ঘটনা থেকে ফজলুল হক উপলব্ধি করলেন শিক্ষা ছাড়া মুসলমান তথা বঞ্চিত মানুষের দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং তাদের রাজনৈতিক অধিকারবোধ ও স্বাধীন চেতনা ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। তাই শিক্ষা বিস্তারকে তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম কর্মোদ্যোগ হিসেবে গ্রহণ করেন। ১৯০৬ সালের শিক্ষা সম্মেলনে ফজলুল হক ছিলেন একজন অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। ঐ সম্মেলনে তিনি মুসলমানদের মধ্যে গণশিক্ষা বিস্তারের কর্মসূচী পেশ করে ভাষণ দিয়েছিলেন; ঐ ভাষণ এ দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের এক মূল্যবান দলিল। তখন তিনি ছিলেন তেত্রিশ বছর বয়সের এক দুর্ধর্ষ যুবক।

গণশিক্ষা বিস্তারে ফজলুল হকের ভূমিকা সত্যই তুলনাহীন। বরিশালে তিনি একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ স্থাপন করেন এবং তিনি সেই কলেজের গণিত-শাস্ত্রের অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করেন। ১৯১২ সালে ফজলুল হক কলকাতায় কেন্দ্রীয় মুসলিম শিক্ষা সমিতি (Central Muslim Educational Association) নামে একটি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। এই মুসলিম শিক্ষা সমিতির মাধ্যমে তিনি মুলসমানদের শিক্ষাকে স্তরে স্তরে এগিয়ে নিয়েছিলেন।

১৯১৪ সালে ঢাকা আসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল প্রাঙ্গণে মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে জনাব এ, কে, ফজলুল হক এক অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন নবাব স্যার সলিমুল্লাহ। সে সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন, "সে বক্তৃতা না শুনলে, তা কল্পনা করা যায় না।" তিনি আরও অভিমত প্রকাশ করেছেন, "ফজলুল হকের এক একটি বক্তৃতা বাংলার সাধারণ মানুষ তথা মুসলমানদের কতখানি জাগ্রত করেছে এবং কতখানি এগিয়ে নিয়েছে, তা বর্তমান বাংলার মানুষ উপলব্ধি করতে পারবে না।"

সাথে ভারতীয় কংগ্রেসের নেতা ছিলেন বটে। কিন্তু তিনি কংগ্রেসের শিক্ষা বর্জননীতি কখনও সমর্থন করেননি। শিক্ষা বর্জন করলে পশ্চাৎপদ বঞ্চিত মুসলমান সমাজ আরো পিছিয়ে যাবে। শিক্ষা ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভের ক্ষেত্রে অধিকার বৈষম্য নীতির শিকার হবে, তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক পদে থাকাকালেও গণশিক্ষা বিস্তারের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ও শিক্ষা বর্জন নীতির ক্ষেত্রে কংগ্রেসের প্রতি তিনি সহযোগিতা প্রত্যাহার করেছেন।

আবুল কাশেম ফজলুল হকের প্রচেষ্টায় ১৯১৬ সালে কলকাতায় 'বেকার হোষ্টেল' ও 'কারমাইকেল হোষ্টেল' প্রতিষ্ঠা হয় এবং তাঁরই একক প্রচেষ্টায় উক্ত দু'টি ছাত্রাবাস থেকে লেখাপড়া শিখেছেন এপার ও ওপার বাংলার বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গ।

১৯১৯ সালে সারা ভারতব্যাপী খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন হয়। ঐ আন্দোলনে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাতে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম ঘটে। একজন সত্যিকার শিক্ষা দরদী হিসেবে ফজলুল হক বুঝতে পেরেছিলেন উক্ত আন্দোলনে কোন সঠিক ও সুষ্ঠু শিক্ষানীতি না থাকায় এই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত শিক্ষা বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হবে। তখন ফজলুল হক ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অসহযোগ আন্দোলনের ঐ আত্মঘাতী নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। পরে দেশবন্ধু ঐ আন্দোলনে যোগদান করেন; কিন্তু ফজলুল হক শিক্ষানীতির জন্য ঐ আন্দোলনের বিরোধীই রয়ে গেলেন।

১৯২০ সালে ফজলুল হক কলকাতায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ এবং নিখিল ভারত খেলাফত সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে ছাত্রদের স্কুল-কলেজ ত্যাগের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "যদি সমস্ত হিন্দু ছেলেরা স্কুল-কলেজ ত্যাগ করে, তাতে তাদের কিছুই যায় আসে না; কারণ তাদের পরিবারের সবাই শিক্ষিত। তারা বাড়ী বসে মা-বাপের কাছেও লেখাপড়া শিখতে পারবে এবং সময় হলে স্কুল-কলেজেও ফিরে আসবে। কিন্তু মুসলমান ছেলেরা স্কুল-কলেজ ছাড়লে সর্বনাশ। তাদের পরিবারে সকলেই অশিক্ষিত। অতএব তারা এমনিভাবে গোল্লায় যাবে যে, সময় হলেও স্কুল-কলেজে ফিরে আসবে না। ফলে মুসলমান শিক্ষাক্ষেত্রে আরও অর্ধ শতাব্দী পিছিয়ে যাবে।" এই সম্মেলনের কিছুদিন পরে ঢাকায় ১৩ ডিসেম্বর মুসলমানদের সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে শিক্ষা বিরোধী নীতির পর্যালোচনা করে কলকাতা সম্মেলনের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেন।

কংগ্রেসের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ১৯২৪ সালের ১ জানুয়ারী জনাব এ, কে, ফজলুল হক অবিভক্ত বাংলার শিক্ষামন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। এই মন্ত্রীত্বের কাল ছয়মাস হলেও উক্ত সময়ের মধ্যে তিনি ...

নামে অভিহিত হয়। ইতিপূর্বে মুসলমানদের শিক্ষক পদে নিয়োগ করা হতো না। ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠার পর সারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুসলমান শিক্ষকদের এনে এই কলেজে তিনি নিযুক্ত করেছিলেন। এই সময় তিনি মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য আলাদা ডাইরেক্টরেট স্থাপন করেন এবং একটি স্বতন্ত্র মুসলিম তহবিল গঠন করেন। তখন স্কুলসমূহে সংখ্যালঘু হিন্দুদেরই একাধিপত্য ছিল। মুসলমান ছাত্রদের স্কুল ভর্তির ব্যাপারটাও ছিল খুবই কষ্টসাধ্য। তা ছাড়া মুসলমান ছাত্রদের সংস্কৃতি পড়তে হতো। কারণ, সরকারী স্কুল ছাড়া অন্য কোন স্কুলে আরবী, ফার্সী পড়ানো হতো না। তিনি উপলব্ধি করলেন, মফস্বল স্কুলে আরবী ও ফার্সী পড়ানোর ব্যবস্থা না করলে মুসলমানদের শিক্ষার আগ্রহ বাড়বে না। তাই তিনি আদেশ জারি করলেন, কোন স্কুল সরকারী সাহায্য পেতে চাইলে একজন মুসলমান শিক্ষক ও একজন মৌলভী রাখতে হবে। চক্রান্তমূলক বিভিন্ন অজুহাতে মুসলমান ছাত্রদের সরকারী স্কুল-কলেজেও ভর্তি করা হতো না। তাই শিক্ষা দরদী ফজলুল হক মুসলমান ছাত্রদের জন্য সকল স্কুল, কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিক্যাল কলেজে রিজার্ভ সিটের ব্যবস্থা করলেন। এমন ব্যবস্থা করলেন যে, মুসলমান ছাত্র পাওয়া না গেলেও রিজার্ভ সিট খালি থাকবে। এই

ব্যবস্থার ফলে মুসলমান শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অগ্রসর হতে পেরেছিল। তাই বলে তিনি হিন্দু বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন না। মুসলমানদের ক্ষেত্রে তিনি সমান অধিকার দাবী করতেন।

মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে আর একটি বাধা ছিল, তা হলো পরীক্ষার নাম লেখার নিয়ম। ফলে হিন্দু শিক্ষকরা মুসলমান নাম দেখলেই পরীক্ষার খাতায় ভাল লিখলেও ফেল করিয়ে দিত। তাই মুসলমানদের পরীক্ষার পাশের হার ছিল অতি নিম্ন এবং উপযুক্ত স্থান দখল করা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। শিক্ষা ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানদের সমান বিচারের জন্য ফজলুল হক প্রবল প্রতিকুলতা ...